OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 558 - 566
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বনফুলের ‘শ্রীমধুসূদন’ জীবনী নাটকে উনিশ শতকীয় সামাজিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ-সন্ধান

সৌম্যজিৎ চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : soumojit111@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Biographical Drama, Bengal Renaissance, Young Bengal, Colonial influence, Reform movement, Nationalism, Marxist approach.

Abstract

Balai Chand Mukhopadhyay, widely known as 'Banaphool', was one of the most prolific authors of Bengali language and literature. Famous for his unique and intricate short stories, he also wrote sixty novels, nearly a thousand poems, numerous essays on diverse topics, five dramas, and several one-act plays during his literary career. Notably, he pioneered the modern Bengali biographical drama. 'Sri Madhusudan', published in 1939, was his first biographical drama. It was based on the life of the famous 19th-century Bengali poet, Michael Madhusudan Dutta. Three years later, in 1942, his second biographical drama, 'Vidyasagar', was published. These two plays gained immense popularity during that period. Surprisingly after this, Banaphool never returned to the biographical drama genre. In this research paper, we will primarily discuss the nature of the nineteenth-century social conflicts portrayed in the play 'Sri Madhusudan'. Additionally, we will critically analyze the success of this play in recreating specific historical period.

Banaphool wrote the play 'Sri Madhusudan' based on Jogindranath Basu's 'Michael Madhusudan Dutter Jeevan-Charita', a well-known biography of Michael Madhusudan Dutta published in 1893. This play is primarily recognized as a product of 20th-century modern Bengali literary thought. However, despite being a biographical drama, 'Sri Madhusudan' also portrays the conflicts and tensions hidden between different social groups and classes during the Bengal Renaissance. Here, we see characters from that period, such as Reverend Krishnamohan Bandopadhyay, a former disciple of Derozio, Rajnarayan Basu, a close associate of Brahma Debendranath Tagore and a prominent member of ‘Tattwabodhini Sabha’, Bhudev Mukhopadhyay, a supporter of conservative thoughts and values, Gourdas Basak, Bholanath Chandra, Madhu's other friends from Hindu College, Barrister Manomohan Ghosh, Rebecca and Henrietta, Madhusudan’s Europian spouces etc. Each of these characters in this play, with their distinct beliefs and practices, alongside

Madhusudan's central character, plays a pivotal role in helping us understand the nature of 19th-century Bengali society under colonial rule.

Discussion

প্রকরণগত বিচারে আধুনিক বাংলা জীবনী-নাটক যে বিশ শতকীয় মনন ও সাহিত্যচর্চার বিশেষ ফলশ্রুতি – গবেষক ও সমালোচক মহলে সে কথা অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, এই নবতম নাট্য-প্রকরণের কায়া ও আদর্শ নির্মাণে নাট্যকার বনফুলের কৃতিত্ব সর্বতোভাবে উল্লেখ্য। নাট্যকার হিসেবে বনফুল তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪২) নাটকে জীবনী-নির্ভর যুগোপযোগী বাংলা নাটক রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পরবর্তীকালে সেই পথে অনেকেই জীবনী-নির্ভর নাটক লিখতে প্রয়াসী হলেও, সবক্ষেত্রে সেই প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে বনফুল রচিত প্রথম জীবনী-নির্ভর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'শ্রীমধুসূদন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এই নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকট বা রূপায়িত হয়েছে, মূলত তাই নিরূপণের চেষ্টা করা হবে। উল্লিখিত দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিচারের ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা খতিয়ে দেখা এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিশেষভাবে জরুরি। নাটকে এরূপ বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনার সমাবেশ বিরল নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই নাটক ব্যক্তি-জীবনী অনুসরণের প্রাকরণিক বাধ্যতাকে অনেকাংশে ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। ফলে নাটকের আধারে মধুসূদন জীবনীর বিষাদদীর্ণ, ট্র্যাজিক রসরূপ নির্মাণের পাশাপাশি নাট্যকার এই নাটকে সমসাময়িক যুগচিত্র অঙ্কনেও যথেষ্ট সফল হয়েছেন।

বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি মুখ্যত যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' (১৮৯৩) গ্রন্থের ওপর আধারিত। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'পশ্চাৎপট' (১৯৭৮)-এ নাট্যকার স্বয়ং একথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত জীবনী-গ্রন্থের থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদান নির্বাচন করে নাট্যকার এখানে মধুসূদনের জীবন-ট্র্যাজেডির যথাযথ নাট্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যি বলতে সমকালে এবং পরবর্তীতেও নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। এই নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন, -

> "বাংলা সাহিত্যে এই মধুসূদন নাটিকাটি নূতনত্ব পেয়েছে। মধুসূদনের চরিত্রচিত্র বাস্তব হ'য়ে উঠেছে।"[১]

তবে শেষপর্যন্ত এই বাস্তবতা নাটকের প্রয়োজনকেই সিদ্ধ করেছে, জীবনীর নয়। এ ব্যাপারে নাট্যকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ইতিহাস বা জীবনচরিত নয়, মধুকবির জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে এক ঐক্যসূত্রে বেঁধে, সংলাপময় দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে এক্ষেত্রে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা নাটক। মাইকেল-জীবনী পাঠের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মনে এই নাটক রচনার প্রাথমিক প্রেষণা জাগে। ফলত মধুসূদনের জীবনের নানান ঘটনার অনুষঙ্গে এখানে উনিশ শতকীয় সমাজ-প্রতিবেশ মূর্ত হয়েছে। এই নাটকের চরিত্রেরা ইতিহাসের এমন এক কালপর্ব থেকে আহৃত যা আমাদের আত্মপরিচয় অথবা সত্তানির্মাণ তথা আমাদের সামগ্রিক হয়ে ওঠা বা গড়ে ওঠার নিরিখে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে বাঙালি সমাজের পরিচিত বিন্যাসে দ্রুত বদল সূচিত হয়েছিল। 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের প্রধান এবং অন্যান্য কুশীলবেরাও সেই বদলের অংশীদার হয়েছিলেন। এই অংশগ্রহণ পরোক্ষ ছিলনা, বরং তা এতখানি প্রত্যক্ষ ও নিবিড় ছিল যার প্রভাব সমাজের পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও বর্তেছিল। সেই প্রভাব আত্মস্থকরণের মধ্যে দিয়ে তাঁরা সকলে নিজেদের সামাজিক তথা ঐতিহাসিক দায়ভার পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে এঁদের অনেকেই সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হিসেবে মান্য হয়েছেন। জীবনী-নির্ভর নাটক রচনার উদ্দেশ্যে নাট্যকার বনফুল তাই খুব সুদূর অতীতে নয়, বরং তাঁর পূর্ববর্তী শতক থেকেই চরিত্র নির্বাচন করে নিতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে প্রকরণের বিচারে নতুন একধরনের নাটক লেখার সূত্রপাত হয় যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে তখনও বাংলা ভাষায় জীবনী-নির্ভর নাটক রচনার এই ঐতিহ্য বাঙালির অনায়ত্ত ছিল।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন, অর্থাৎ মহাকবির জীবনের শেষ ত্রিশ বছরের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের কাহিনী আবদ্ধ। তবে এই সময়পর্বে কবির জীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ নাটকে নেই। বরং এক্ষেত্রে নাট্যকার কিছুটা স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। কবির জীবনী থেকে তিনি সযত্নে সেই সব উপাদান সংগ্রহ করেছেন যা তাঁর চরিত্রের অমোঘ, অনিবারণীয় পরিণতির নাটকীয় রসরূপ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নির্মাণে সহায়ক হবে। তাছাড়া মধুসূদনের জীবনে নাটকীয়তার কোনও অভাব ছিলনা। হিন্দু কলেজের ছাত্র, ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের প্রিয়শিষ্য মধুসূদন তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে বিবেচিত হতেন। নাটকেও তাঁর বন্ধুরা এবিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের সাক্ষ্য জানিয়েছেন। এই বন্ধু, সহপাঠীদের মধ্যে আমরা সেখানে গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দেখা পেয়ে যাই। বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল, তা বাঙালির দীর্ঘকালীন জড়তাকে ভীষণভাবে আহত করে। প্রসঙ্গত ডিরোজিও এবং তাঁর অনুসারী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কথা স্মরণ করা যায়। নাটকে চরিত্র হিসেবে যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তরুণ বয়সে তিনি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। বিলেত যাওয়ার পাশাপাশি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য মধুসূদনের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ হিসেবে নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত উভয়ক্ষেত্রেই মধুসূদনকে আশাহত হতে হয়। নাটকের সপ্তম দৃশ্যে বন্ধু গৌরদাসকে, মধু স্বয়ং সেকথা জানিয়েছেন –

> “মধু। ...ভাই গৌর, বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়! আমার মনে শান্তি নেই-রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These rascals have treated me shabbily—বিলেত নিয়ে যাবে আশা দিয়েছিল— but now they are very cold about it. But go to England I must.”[২]

আবার নবম দৃশ্যে কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে সংলাপেও এ ব্যাপারে মধুসূদনের ক্ষোভ ধরা পড়েছে। তাঁর ও দেবকীর পরিণয়ের বিপক্ষে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, মধুর মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলার প্রসঙ্গ টেনে আনায় প্রতিবাদী মাইকেল তাঁকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেছেন যে, একদা ডিরোজিও’র শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য, ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান, এমনকি নিজের পরিবার থেকে বিতাড়িত কৃষ্ণমোহন, কীভাবে তাঁর প্রতিশ্রুত বাক্য থেকে সরে আসতে পারেন –

> “মধু। May I ask you one question, sir? Are you not a disciple of the famous Derozio? Is he not the man who made drinking a fashion amongst us? Is it not a fact that you yourself drank, ate beef and were turned out of your own home? আপনি আমাকে বলছেন— উচ্ছৃঙ্খল মাতাল!”[৩]

বলা বাহুল্য, মধুসূদনের এই অভিযোগ অসঙ্গত নয়। ইউরোপীয় শিক্ষা এবং জীবনবীক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল বা ‘ইয়ং ক্যালকাটা’র সদস্যেরা আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, হিন্দুধর্মের বিরোধিতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজে তুমুল আলোড়ন তৈরি করেছিলেন। সেকালের সংবাদ-সাময়িকপত্রে (সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি) তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছিল যার মধ্যে ফিরিঙ্গি পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণ, অপরিমিত মদ্যপান, দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ, গোমাংস ভক্ষণ, নাস্তিকতা প্রচার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য –

> “অপর প্রযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ কর‍্যে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ কর‍্যে জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা মহিষটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে যায় অতএব মেম্বর মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কুরীতির পরিবর্তে সুনীতিগুলীন সংস্থাপন করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের সুরীতির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> শাসন উল্লঙ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজ হইতে বাহির করিয়া দেন এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়া দেখুন কিপর্য্যন্ত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয়...।"[৪]

তবে সেকালে কেবলমাত্র রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের তরফ থেকেই যে নব্যবঙ্গীয়দের বিরোধিতা করা হয়েছিল তাই নয়, পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিরাও, ইউরেশীয় কবি ও শিক্ষক ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রদের গতিবিধির প্রতি সন্দিহান ছিলেন। এমনকি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বিরোধিতায় তাদের একজোট হতেও দেখা যায় –

> "রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ শুধু ডিরোজিও-বিরোধিতা করেননি, এই বিরোধিতায় খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিশেষ সক্রিয়তা ছিল। ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গে ডিরোজিও-পরিবারের যোগ থাকলেও প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ তথা আলেকজান্ডার ডাফ ভারতবর্ষে আসার পর থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের প্রতি তাঁরা প্রসন্ন ছিলেন না।"[৫]

আসলে ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির (Free Rational Thinking) প্রতি একধরনের আনুগত্য ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাছাড়া ছাত্রেরা তাঁদের গুরুর থেকে স্বদেশপ্রেম ও সততার শিক্ষা লাভ করেছিল। স্বভাবতই নাটকে কৃষ্ণমোহনের পরিবর্তন মধুকে বিস্মিত, ব্যথিত করেছে। উল্লেখ্য, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের মতো একক চরিত্র হিসেবে অবতীর্ণ না হলেও নাটকে প্রসঙ্গক্রমে রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মতো অন্যান্য নব্যবঙ্গীয়দের উল্লেখ রয়েছে।

'ভারতে বৃটিশ শাসন' (১০ই জুন, ১৮৫৩) এবং 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' (২২শে জুলাই, ১৮৫৩) প্রবন্ধদুটি, ভারতীয় সমাজ ও তার বিবর্তন সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ভাবনার স্মারক বহন করছে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও ইংরেজের শাসন ভারতবর্ষে সামাজিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করেছে বলে মার্কস এখানে মন্তব্য করেন –

> "এ কথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল - এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"[৬]

বস্তুত চিরাচরিত গ্রামগোষ্ঠী-সংগঠন ও তাদের অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে ইংরেজ ভারতীয় সমাজের উৎপাদন সম্পর্কে মৌলিক বদল আনে। এই বদলের লক্ষণগুলি উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজে ক্রমে সুস্পষ্ট হয়। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার, সংবাদ-সাময়িকপত্রের আবির্ভাব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সামাজিক শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিভিন্ন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে যেমন যাবতীয় পুরনো আচার-সংস্কার-মূল্যবোধ-রীতিনীতিকে নতুন শিক্ষার আলোকে পরখ করে নেওয়ার অভ্যাস দেখা যায়, তেমনই সমাজের রক্ষণশীল অংশের সুসংহত বিরোধিতার দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। দীর্ঘকালীন জড়তাভঙ্গের ফলে সমাজের তথাকথিত শান্তি বিঘ্নিত হয়, পাশাপাশি সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে।

নাটকে মধুসূদন চরিত্রের মধ্যে এক বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বন্ধুদের ভাষায় 'rebel' বা 'revolutionary' মধু বসনে-বেশভূষায় খাঁটি ইউরোপীয়। শেক্সপীয়র ও মিলটনের দেশ তাঁর কাঙ্ক্ষিত তীর্থস্থল। অমিত আকাঙ্ক্ষা ও তার অচরিতার্থতা – নাটকে মধুর চরিত্রের পরিণতিকে দ্যোতিত করেছে। সমকালীন হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতাকে অস্বীকার ও তার বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের বিদ্রোহ ফুরিয়ে যায়নি, অধিকন্তু তা তাঁকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পথে চালিত করেছে। কিন্তু ইংরেজিতে কাব্যচর্চা করলেও, 'নেটিভ' মধুসূদন ইংরেজের থেকে কোনও বিশেষ স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারেননি। এমনকি বিশপস কলেজে পাঠরত অবস্থায় গোরাদের পাশে মধু ও অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হয়। মধুর তরফ থেকে এর প্রতিবাদ নাটকের একাধিক দৃশ্যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের চোখে পড়বে। যেমন নবম দৃশ্যে কলেজে তাঁর আচরণ সংক্রান্ত কৃষ্ণমোহনের অভিযোগের উত্তরে মধু জানিয়েছেন–

> "মধু। Ashamed? Why? খাবার পর প্রত্যেক student-কে wine দেওয়ার নিয়ম – that is our legitimate due. Why will that rascal of a steward refuse to give us our share?
> কৃষ্ণমোহন। He did not refuse – মদ আর ছিল না – that is a fact – ফুরিয়ে গিয়েছিল।
> মধু। ফুরিয়ে গিয়েছিল? সাহেবদের বেলায় ফুরোয় না, আর Indian student-দের বেলাতেই ফুরিয়ে যায়? I won't tolerate this injustice, I am simply fed up with the distinction They make between black skin and white skin."[৭]

খুব স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রের অন্তর্লীন মর্যাদাবোধ ও আভিজাত্যের গরিমায় এহেন মধুসূদনের পক্ষে কলকাতার 'ইস্ট-ইন্ডিয়ান' সমাজে মিশে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছে। তাই বিদেশিনী অর্ধাঙ্গিনীর পাশে এই একক, নিঃসঙ্গ মাইকেলের মধ্যে নাট্যকার উৎপল দত্ত, ষোড়শ শতকের স্পেনীয় লেখক মিগুয়েল দ্য সেরভান্তেস কর্তৃক সৃষ্ট অবিকল্প দন কিহোতে চরিত্রের তুলনা খুঁজে পেয়েছেন। আর সত্তার অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল এই ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্যের সার্থক রূপদানের ফলে কিছু কিছু ত্রুটি (যেমন: কালানৌচিত্য দোষ) থাকা সত্ত্বেও নাটকে মধুর চরিত্র এত জীবন্ত হয়েছে।

'মধুসূদন-স্মৃতি' গ্রন্থে, উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের প্রেক্ষিতে মাইকেলের স্থান-নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রাবন্ধিক সঞ্জীব সেন, সমকালীন মননচর্চার তিনটি ধারার উপস্থিতির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন। নবজাগরণের এই ত্রিধারা বিংশ শতকের চিন্তার উজ্জীবন ঘটিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন খাতে। এরা হল – নব্যমানবতাবাদী ধারা, যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তির ধারা এবং সর্বোপরি নব্য হিন্দুত্বের ধারা। প্রাবন্ধিক যথাক্রমে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে প্রথম, ডিরোজিওকে দ্বিতীয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে তৃতীয় ধারার প্রাণপুরুষ রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবার প্রথমোক্ত দুই ধারার বিরোধিতায় সমাজের রক্ষণশীল অংশ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কীভাবে সংহত বা একজোট হয়েছিল, সে উল্লেখ পূর্বে রয়েছে। অন্যদিকে আলোচ্য নাটকে ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গলের পাশাপাশি অন্যান্য ধারার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও লক্ষ করা গিয়েছে। পাশাপাশি অনেক সংলাপে আলাদা আলাদা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী একাধিক সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যারা তৎকালীন সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বা স্বরূপ বুঝতে সহায়তা করে। প্রসঙ্গত 'জ্ঞানান্বেষণ' 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' থেকে শুরু করে 'তত্ত্ববোধিনী', 'চন্দ্রিকাপ্রকাশ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'দ্য রিফর্মার', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'বেঙ্গল হরকরা', 'মাদ্রাস সারকুলেটর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সিটিজেন' সহ আরও বেশ কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের নামোল্লেখ করা যায়। এমনকি নাটকের সর্বশেষ দৃশ্যে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-এর উল্লেখ পর্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে; যদিও তা স্রেফ উল্লেখমাত্রই। তবে উল্লিখিত অন্যান্য পত্রপত্রিকাগুলি সমসাময়িক কালপর্বের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গের সংকেত পাঠকের কাছে ঠিকই হাজির করে।

ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচলন সমাজ-অভ্যন্তরে কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সেকথা ইতিপূর্বে প্রবন্ধে আংশিকভাবে এসেছে। ইংরেজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেকালে এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সাথেই রেলপথের বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই ঔপনিবেশিক শাসকের নিজস্ব স্বার্থের অনুকূলে প্রণীত হয়েছিল। অথচ এই প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্মোচন ও প্রসার, পরাধীন ও বিজিত এক বিপুল জনগোষ্ঠীর হাতে ভাবী পরিবর্তনের অমোঘ আয়ুধ তুলে দিয়েছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানোদয়ের ফলে উদ্ভূত দেশীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী (Local Intelligentsia), বিভিন্ন সামাজিক নীতি ও আইনকানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি এই শ্রেণীর গভীর সম্ভ্রমবোধের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতার এহেন প্রচেষ্টা একমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি তাঁদের কুণ্ঠাহীন আনুগত্যের পরিচয়বাহক নয়। এই প্রসঙ্গে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে –

> "ইংরেজরা পুরোদস্তুর ক্ষমতায় আসবার পর আমাদের দেশটাকে কীভাবে দ্রুত গড়ে তোলা যায়, কী করে ইংরেজদের সভ্যতার সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেই তাদের সমতুল্য হয়ে ওঠা সম্ভব, সেটাই ছিল আমাদের বরেণ্য, সংস্কারকদের লক্ষ্যস্থল।"[৮]

অবশ্য এই প্রবণতার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাদেশিকতার প্রথম অঙ্কুর যা যথাকালে, উপযুক্ত পরিবেশে পরিস্ফুট হয়েছিল। নাটকে, মধুসূদন চরিত্রের মধ্যে এই স্বাদেশিকতাবোধের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন বিশপস কলেজে 'নেটিভ' ক্রিশ্চান মধুসূদনের ওপর ইউরোপীয় কলেজিয়েট পোশাকের বদলে সাদা ক্যাসক পরে আসার হুকুম জারি হলে তিনি 'বহুবর্ণ বিচিত্রিত' জাতীয় পোশাক পরে কলেজে হাজির হয়েছেন। আবার কলেজের স্টুয়ার্ড ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ ওয়াইন দিতে অসম্মত হলে প্রতিবাদী মধু যেভাবে খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার করে উঠে এসেছেন, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ পূর্বেও রয়েছে। সুতীব্র মর্যাদাবোধের পাশাপাশি এহেন কাজ নাটকে মধুসূদন চরিত্রের দৃঢ়তা ও স্পর্ধিত আত্মপ্রত্যয়কে প্রতিফলিত করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি তিনি পিতা রাজনারায়ণের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়, যার একাধিক প্রমাণ নাটকে রয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, মধুসূদনের স্বদেশ তথা বঙ্গপ্রীতির দৃষ্টান্ত এরপর নাটকের দশম দৃশ্যে নটবরের সাথে কথোপকথন পর্বে পরিলক্ষিত হয়। মাদ্রাজে ইউরোপীয় কায়দায় সজ্জিত মধুর অন্দরমহলে সাক্ষাৎপ্রার্থী নটবরের সাথে বঙ্গদেশ ও সমাজের সংবাদ এসে প্রবেশ করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টান মধুসূদন, বন্ধু গৌরদাসের থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। কিন্তু পত্র দ্বারা অনুরোধের পরেও গৌরের তরফ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় অভিমানী মধুসূদন বাংলাদেশের খবর শুনে উচ্ছ্বাসের বদলে অনীহা প্রকাশ করেছেন – "I refuse to be interested in anything that concerns Bengal"[৯], আর সেজন্যই জর্জ টমসনের British India Society এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের Bengal Landholders Association -এর মিলিত সংগঠন British India Association তৈরির খবরও মধুর কাছে ফিকে হয়ে গিয়েছে। দেশীয় জনতার পরিচয় বহনকারী, প্রচলিত 'নেটিভ' শব্দ ব্যবহার করায়, নটবরের বিরুদ্ধে মধুর সচেতন প্রতিবাদও এখানে লক্ষণীয়।

দ্বাদশ দৃশ্যে মিশনারিদের প্রতি আস্থাচ্যুত, মাতৃহারা মধুর সংলাপে আবারও বাংলাদেশের প্রতি গভীর অভিমান ঝরে পড়েছে। নটবর বাংলায় লেখার অনুরোধ জানালে তীব্র আক্ষেপবশত মধুসূদনের উক্তি –

> "মধুসূদন। বাংলা লেখবার জন্যে নিজেই আমি ছটফট করছি; I know I can make and remake that language, বাংলা ভাষার চেহারা বদলে দিতে পারি আমি। কিন্তু কেউ আমার লেখা পড়বে না, বাংলাদেশ চায় না আমাকে and I know it for certain."[১০]

পিতার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আগত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সাথে আলাপচারিতার সময়েও মধু চরিত্রের মধ্যে 'বাঙালীসুলভ' এই প্রগাঢ় অভিমানবোধ সংক্রামিত হয়েছে।

এছাড়া চতুর্দশ দৃশ্যে রঙ্গলালের কবিতার প্রশংসায় মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতির অন্তর্লীন দীপ্তির আঁচ পাওয়া যায়। যদিও এই প্রীতি কোনরকম সংকীর্ণ গণ্ডি বা সীমার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলনা। বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একাধিক সাহিত্যাদর্শ থেকে তাঁর রচনাকর্মের বিষয় ও আঙ্গিক নির্বাচনের প্রবণতার মধ্যে এই অনুভূতির সম্যক প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

এরপর পঞ্চদশ দৃশ্যে মধু-বিদ্যাসাগর কথোপকথন পর্বে, বিদ্যাসাগর যখন 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদক হিসেবে মধুসূদনের নামোল্লেখ করেন (যদিও এই তথ্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে), তখন তাও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর দরিদ্র প্রজার পক্ষাবলম্বনের ভূমিকাকেই সাব্যস্ত করে। আবার অষ্টাদশ দৃশ্যে সাগরদাঁড়ি থেকে আগত প্রবীণ পণ্ডিতমশাইয়ের প্রতি মধুর আচরণে বিস্মিত গৌরদাসের মন্তব্য, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচায়ক –

> "গৌরদাস। লোকটা বাইরে খাঁটি সায়েব অথচ অন্তরে খাঁটি বাঙালী। আশ্চর্য!"[১১]

এভাবে মধুসূদন চরিত্রের মধ্যে মূর্ত গভীর স্বদেশানুরাগ নাটকে বারবার তাঁর বিদ্রোহী সত্তার পরিচয়কেই উন্মোচিত করেছে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার আলোচ্য নাটকে মধুসূদনের পাশে যে সমস্ত চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়, তাঁদের সকলের পরিবর্তন ও পরিণতি একই পথে ঘটেনি। তবে ঔপনিবেশিক শাসকের প্রতি তাঁদের মনোভঙ্গি সময়ের সাথে সাথেই ক্রমশ বদলে গিয়েছে। এই শাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে অনবগত না হলেও প্রথমদিকে এঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং মুগ্ধতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এঁরা অনেকেই বৃটিশ প্রশাসকের বিরুদ্ধে 'চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি' পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা সম্ভব যে তৎকালীন সমাজের প্রধানতম দ্বন্দ্বের চরিত্র এঁদের কাছে যথারূপে প্রতিভাত হয়েছিল –

> "বর্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্য বিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া আর এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্তমান প্রভুরা যত ভাল, তত ভাল না হইতেও পারেন। অতএব এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশা পূরণ করেন না। পূর্ব্বে সাহেবেরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলণ্ড গমনের সুবিধা হওয়াতে এদেশের প্রতি সাহেবদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা মমতা কমিয়া গিয়াছে...।"[১২]

১৮৭৩ সালে 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসু একথা উল্লেখ করেন। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যেও দেখি বন্ধুপরিবৃত রাজনারায়ণ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-প্রকাশক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্রের সাথে যুগ্মভাবে তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। বিধবা বিবাহের সপক্ষে জনমত গঠনে বেঙ্গল স্পেক্টেটরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। তাছাড়া খাদ্যাভ্যাস সংস্কারের প্রশ্নে এই পত্রিকা নিরামিষ খাবারের পরিবর্তে মাছ-মাংসের মতো জীবনীশক্তির বিবর্ধক আমিষ খাদ্য গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছিল। সর্বোপরি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আরও বেশি সংখ্যক দেশীয় প্রার্থীর অন্তর্ভুক্তির পক্ষেও তৎকালীন সময়ে বেঙ্গল স্পেক্টেটর জোর সওয়াল করে। এহেন পত্রিকা এবং রামগোপাল ঘোষের প্রসঙ্গ এই নাটকে একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে।

যাইহোক, মধুর খ্রিস্টান হওয়াকে সর্বতোভাবে সমর্থন না করলেও নাটকের এই একই দৃশ্যে রাজনারায়ণ সমকালীন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। স্বভাবতই 'স্বদেশীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী', রক্ষণশীল ভূদেব তাঁর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের গতিবিধির কথা প্রকাশ্যে এনেছেন যা তথ্যগত বিচারে নির্ভুল। ব্রাহ্মসমাজের অনুসারী রাজনারায়ণ একসময় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি এই পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার সদস্যও ছিলেন। মতাদর্শ প্রচার ও নীতিগত ক্ষেত্রে এই সভার অন্যান্য সদস্যদের বিরোধিতায় ক্ষুণ্ণ দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্যে লিখছেন –

> "কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইঁহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কার না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"[১৩]

দেবেন্দ্রনাথের এহেন মন্তব্য থেকে সমসাময়িক মেধা ও মননচর্চার দ্বন্দ্ববিরোধপূর্ণ, বহুরৈখিক স্বরূপটির পরিচয় পাওয়া যায়, যা বর্তমান নাটকেও নানাভাবে আভাসিত হয়েছে।

রাজনারায়ণ ছাড়া মধুসূদনের অপরাপর বন্ধু হিসেবে নাটকে উপস্থিত ভূদেব চরিত্রটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ভূদেবের মধ্যে রক্ষণশীল, সনাতন পন্থায় বিশ্বাসী যুবকের পরিচয় মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ভূদেব শুধু আচার-ব্যবহারে রক্ষণশীল ছিলেন তাই নয়, পাশাপাশি তিনি উনিশ শতকের একাধিক মৌলিক সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধতাও করেছেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষক ভূদেবের ঘোর আপত্তির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করা যায়। এমনকি ভূদেব জাতিভেদপ্রথার সপক্ষেও লেখনী ধারণ করেছেন। যদিও আলোচ্য নাটকে সেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, থাকার কথাও নয়। বরং মধুসূদনের আন্তরিক বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই ভূদেব চরিত্রটি নাটকে স্থান পেয়েছে। তাঁর অনুরোধে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার কথা নাটকে মধু স্বয়ং বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছেন। সর্বোপরি সৌখিন নাট্যশালার প্রসারের যুগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক তথা পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 'দ্য রিফর্মার' পত্রিকার সম্পাদক, অভিজাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণোত্তর পর্বে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুসূদনের দুই স্ত্রী রেবেকা ও হেনরিয়েটা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের 'গোঁড়া হিন্দু' স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী ও কন্যা দেবকী (দৈবকী) প্রভৃতি চরিত্রগুলি কিছুটা গৌণভাবে নাটকে স্থান লাভ করেছে।

এভাবে মধুর সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি নবযুগের সাক্ষ্য বহনের পাশাপাশি নাটকে যুগের অন্যবিধ লক্ষণ বা সংকেতগুলিকেও মূর্ত করে তুলেছে। তার মধ্যে থেকে ঔপনিবেশিক শাসনে শাসক-শাসিত সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম টেনশন বা উত্তেজনার দিকটি যেমন শনাক্ত করা সম্ভব, তেমনি সমাজে স্বার্থরক্ষাকারী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং তাদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের রূপরেখাঙ্কনও নিতান্ত কঠিন নয়। ফলত জীবনী-নির্ভরতার প্রকরণগত ঘেরাটোপ অতিক্রম করে এই নাটক, উনিশ শতকীয় বাঙালি-মননচর্চার বিবিধ মাত্রাগুলিকে দ্যোতিত করে। আর সেই দ্বন্দ্বমুখর, বহুমাত্রিক, তরঙ্গক্ষুব্ধ সময়ের ক্যানভাসে নাট্যকার আমাদের মধুসূদন চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করান যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম এপিক, ওড, সনেট, প্রহসনের সার্থক স্রষ্টা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, সদা বিদ্রোহী এবং সমকালীন যুগচেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক।

Reference:

১. বনফুল, 'রবীন্দ্র স্মৃতি', প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৬২
২. বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৬
৩. তদেব, পৃ. ৫৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩৪০, কলকাতা, পৃ. ১৭২
৫. রায়, অলোক, 'উনিশ শতক', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৯১
৬. মার্কস, কার্ল, মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি (৩য় খণ্ড), প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯, মস্কো, পৃ. ১৪৩
৭. বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৫৫
৮. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'শতবার্ষিকীর আলোছায়ায়', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৯
৯. বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৫৮
১০. তদেব, পৃ. ৭০
১১. তদেব, পৃ. ১০৪
১২. বসু, রাজনারায়ণ, 'সে কাল আর এ কাল', দ্বিতীয় মুদ্রণ, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮০০ শক, কলকাতা, পৃ. ৭৮-৭৯
১৩. রায়, অলোক, 'উনিশ শতক', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৭২

Bibliography:

বনফুল, 'শ্রীমধুসূদন', কলকাতা, অষ্টম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, ২০০৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 566
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০

ঘোষ, ড. অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬

দত্ত, বিধান সম্পাদিত, মধুসূদন স্মৃতি, সাহিত্যম, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

ঘোষ, অমলকুমার, ‘বনফুলের জীবনী নাটক শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২৩